নবাবগঞ্জ উপজেলা প্রোপার থেকে মাত্র দুই কিমি দুরে বাংলাদেশের প্রথম অতিপ্রচীন বুদ্ধবিহার যাহা স্থানীয় ভাবে সীতার কোট নামে পরিচিত।কথিত আছে বা সেইখানের হিন্দু সম্প্রদায়গন এবং এলাকা বয়স্ক লোকেরা বিশ্বাস করে , রাজা যশরথের জৈষ্টপুত্র শ্রীরামের  পত্নী সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন এই পঞ্চবট্টি  বনে । বনবাসের পরে সীতা আশ্রয় পেয়েছিলেন বাল্মিকি মনির কাছে আর বাল্কি মনি যেখানে তপস্যা করতেন তার নাম মনির থান নামে পরিচিত । স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়গন বিশ্বাস করেন এই বনেই রামের স্ত্রী সীতার বনবাস হয়েছিলো। এই লোকো কথা যদি সত্য হয় তাহলে হিন্দুদের জন্য বা শরনার্থীদের  কাছে বিশ্বের একটি চমকপ্রদ স্থান হবে ।

আয়তন ও বর্ণনা : এই স্থাপত্যটি পরিকল্পনায় প্রায় বর্গাকৃতির (পূর্ব-পশ্চিমে ৬৫.২৩ মি এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬৪.১১ মি)। বিহারটির উত্তর এবং দক্ষিণ বাহুদ্বয় বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত ছিল। প্রশস্ত মুখপাত(frontage) বিশিষ্ট তোরণ কমপ্লেক্সটি উত্তর বাহুর মধ্যাংশে অবস্থিত।

তোরণ অংশে ছিল ছুটি প্রহরীকক্ষ। বিহারের প্রবেশ পথটি ছিল উন্মুক্ত জায়গা দিয়ে একটি প্রবেশ কক্ষের দিকে। প্রবেশ কক্ষটি ছিল বিহার কক্ষের সারিতে একই রেখায়। পূর্ব বাহুর উত্তরাংশে পেছনের দেওয়াল ভেদ করে একটি সম্পূরক প্রবেশপথ ছিল। দক্ষিণ বাহুর বহির্মূখী অভিক্ষেপটি ছিল একটি হল ঘরের মতো এবং সেই হল ঘরে ঢুকতে হতো ভেতর দিক দিয়ে। বিহারটিতে ৪১টি কক্ষ ছিল, উত্তর বাহুতে ৮টি এবং অন্য তিন বাহুতে ১১ টি করে। কক্ষগুলি ছিল প্রায় সমআয়তনের (৩.৬৬মি×৩.৩৫ মি)। কক্ষগুলির পেছনের দেওয়ালে কুলুঙ্গি ছিল এবং কক্ষগুলি দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। বিভাজক দেওয়ালের পুরুত্ব ছিল ০.৯১ মিঃ থেকে ১.২২ মি এবং পেছনের দেওয়ালের পুরুত্ব গিল ২.৫৯ মি, কিন্তু সম্মুখের দেওয়ালের পুরুত্ব ছিল ১.০৭ মি। বিহারের ভেতরের দিকে ২.৫৯ মি প্রশস্ত একটি অভ্যন্তরীণ টানা বারান্দা ছিল। ১.৬৮ মি লম্বা এবং ১.০৭ মি প্রশস্ত দরজার মাধ্যমে বিহারের কক্ষগুলি অভ্যন্তরীণ টানা বারান্দার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। একটি ১.২২ মি পুরু এবং ০.৭৬ মি উচ্চতা বিশিষ্ট দেয়াল সমগ্র বারান্দাকে অঙ্গিনা থেকে আড়াল করে রাখত। বিহারের পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রীয় কক্ষত্রয় অন্যান্য সাধারণ কক্ষের তুলনায় আয়তেনে বড় ছিল। প্রতিটি কেন্দ্রীয় কক্ষের একটি করে ইটের বেদি ছিল। সেখানে পূজার মূর্তি রাখা হতো । খুব সম্ভবত দক্ষিণ দিকে কেন্দ্রীয় কক্ষটি ছিল প্রধান মন্দির। প্রধান মন্দিরটির সম্মুখে স্তম্ভ শোভিত প্যাভিলিয়নটি মন্ডপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।

বিহার ভবনের দক্ষিণ দিকে একটু দূরে কিন্তু মূল ভবনের সঙ্গে আবৃত পথ দ্বারা সংযুক্ত সম্মুখভাগে বারান্দাসহ পাঁচটি কক্ষ পাওয়া যায়। পন্ডিতদের অভিমত এগুলি শৌচাগার হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। ছাদ ঢালাইয়ের জন্য চুন, সুরকি এবং ভার বহনের জন্য কড়িকাঠের ব্যবহার দেখা যায়। সীতাকোট বিহার আঙ্গিনার মধ্যবর্তী স্থানে প্রধান মন্দির ছিল না। এখানে পাহাড়পুর, শালবন বিহার এবং আনন্দ বিহারের মতো ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির ফলক অনুপস্থিত। তবে আকার আয়তনের দিক দিয়ে সীতাকোট বিহারের সঙ্গে বগুড়ায় অবস্থিত ভাসু বিহারের অনেক মিল রয়েছে।

ব্রোঞ্জনির্মিত একটি বোধিসত্ত্ব পদ্মাপাণি এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তি সীতাকোট বিহার থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন। মূর্তি দুটির গঠনশৈলী থেকে অনুমান করা যায়, এগুলি ৭ম-৮ম শতাব্দীতে তৈরী। বিহার নির্মাণ সম্পর্কে দুটি নির্মাণকালের কথা বলা হলেও স্তরবিন্যাস পদ্ধতিতে বিহারের কাল নির্ধারণ করা হয় নি।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়  বিহারের উত্তর দিকে মাড়াষ গ্রামের মহিরউদ্দিনের পুত্র  মোঃ তালেব আলী বিহারের পার্শ্বে জমি চাষ করতে গিয়ে জরাজীর্ণ একটি  ধারালো অস্ত্র (বাইশ) কুড়িয়ে পান। এ অস্ত্র দিয়ে ১/২ কোপে বনের বড় বড় শাল গাছ কাটা যেত। বিষয়টি বন বিভাগের লোকজন টের পেয়ে তালেব আলীকে জিজ্ঞাবাদ করলে তালেব আলী বন বিভাগের লোককে ওই অস্ত্রটি প্রদান করে। বন বিভাগের কর্মকর্তা অস্ত্রটি পরীক্ষার জন্য উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। পরে জানা যায় অস্ত্রটি  ছিল হীরার তৈরী।  বিষয়টি জানাজানি হলে আরও মুল্যবান প্রত্নতত্ত্ব মিলতে পারে বলে তৎকালীন দিনাজপুর জেলা পরিষদ নিজস্ব অর্থে বিহারটি খননের উদ্যোগ গ্রহণ করে। চাকরি দেয়া হয় তালেব আলীকে ওই বিহার পাহারা দেয়ার। কয়েক বছর পুর্বে তালেব আলী মারা যায়। বর্তমানে তালেব আলীর পুত্র ঐ তার পিতার দায়িত্ব পালন করছে। খননের পর সে সময় বিহারের কিছু অংশ সংস্কার করা হয়। এর পরে আর কোন সংস্কার না হওয়ায় অযত্নে ও অবহেলায় বিহারটি বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে।

সুত্র : বিভিন্ন পত্রপত্রিকা/ওয়েব সাইড/উইকিপিডিয়া/ লেখক: স্বপন/নিড ফাউন্ডেশন।